শিশুদের ফেল করালে কি আমরা পাস করব?

সুশলী সমাজপতি

২০০৯ সালে ভারতবর্ষের তৎকালীন ইউ-পি-এ সরকার সারা ভারতে সরকারি ও সরকার-পোষিত ইস্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল প্রথা তুলে দেয়। সে বছরেই দেশের সংসদে শিক্ষার অধিকারর (Right to Education) আইনটি পাস হয়, যাতে বলা হয় দেশের ইস্কুল-ছুট শিশুদের ইস্কুলে ফিরিয়ে আনতে, এবং সামগ্রিকভাবে দেশের শিশুদের বিদ্যালয়মুখি করে তুলতে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল তুলে দিয়ে নো-ডিটেনশন (No-detention) নীতি চালু করা হবে, যাতে দেশের শিশুরা-বিশেষত সামাজিকভাবে দুর্বল আর পিছিয়ে পড়া অংশের শিশুরা-পরীক্ষার ভয় কাটিয়ে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু, তার পর আধ দশক যেতে-না-যেতেই দেশের শিক্ষকমহলের এক বড়ো অংশ এবং অভিভাবদের পক্ষ থেকেও অভিযোগ আসতে লাগল যে এই নীতি রূপায়ণের ফলে দেশের শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে- এবং ক্রমে সে অভিযোগের সুর উঁচু পর্দায় উঠতে শুরু করল। এহেন পরিস্থিতিতে, ২০১৫ সালেতর আগস্ট মাসে, এন-ডি-এ পরিচালিত নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত Central Advisory Board of Education তাদের প্রথম সভাতেই সুপারিশ করে যে সারা দেশের ইস্কুলগুলিতে পরীক্ষা-ব্যবস্থা আর পাস-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনতে হবে-তবে তার আগে সেই বোর্ডের সদস্যরা লিখিতভাবে দেশের সব রাজ্য সরকারের লিখিত মতামত জানতে চান। যতদূর জানা গেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মতামত জানিয়েছেন যে তাঁরা দেশের ইস্কুলগুলিতে পাস-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনতেই আগ্রহী। সুতরাং, সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে পাস-ফেল প্রথা আবার চালু হয়ে যাবে।

পরীক্ষা এবং পাস-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন, বিশেষত যাঁরা মনে করছেন যে এই প্রথায় অবলুপ্তির ফলে দেশে শিক্ষার মানের পতন ঘটেছে। সাধারণভাবে শিক্ষক ও অভিভাবকমহলেও প্রধানত খুশির জোয়ারই বইছে – অনেকেই ভাবছেন যে পরীক্ষাব্যবস্থা তুললে দেওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষকদের মধ্যে যে দায়সারা ভাব দেখা দিয়েছিল তার অবসান হবে, আর তাহলে শিক্ষার মানের পতনকে রোধ করা যাবে। বস্তুত, দেসের অধিকাংশ সংবাদদমাধ্যমও মোটের ওপর এন-ডি-এ সরকারের এই উদ্যোগ শিক্ষার যথার্থ মাননির্ধারণে ও মানোন্নয়নে সহায়তা করবে। তবু, চতুর্দিক থেকে যখন তারস্বরে পরীক্ষা ও পাস-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার পক্ষে এমন জোরালো সওয়াল করা হচ্ছে, তখন-নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ক্ষীণকন্ঠে কিছু নিবেদদন রাখা যাক।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ বা বিভিন্ন বর্গের মানুষের হাল-হকিকত যাঁরা জানেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে মানবেন যে আমাদের দেশে গরিব, আদিবাসী ও প্রান্তিক সমাজের ছেলেমেয়েদের (বিশেষত মেয়েদের) ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম ধরে তাদের পড়াশোনার কোনো অভ্যেস থাকে না বলে তারা চট করে ইস্কুল-মুখো হতে চায় না, আর পরীক্ষায় বসা তাদের কাছে একটা বিভীষিকা। পরীক্ষার ভীতি তাদের মধ্যে এতটাই কাজ কররে যে অনেক সহজ জিনিসও তারা চট করে মনে রাখতে পারে না। কিন্তু তা বলে তারা যে মূর্খ বা নির্বোধ সে কথা ভাবার কোনো কারণ নেই, তাদের পড়াশোনার অভ্যেস গড়ে তোলার সময় দিতে হবে। মুশকিল হলো, তারা পরীক্ষায় ফেল করলেই তাদের বাড়ির লোক বলে বসেন, ঢের হয়েছে, আর ইস্কুলে যেতে হবে না। ফলে, তাদের পড়াশোনার অভ্যেসটাই গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। তাদের সেই অভ্যেস গড়ে তোলার সুযোগ দিতেই পাস-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা একটু উঁচু ক্লাসে উঠে পড়াশোনার আসল স্বাদটা পায়, বা তারা সে স্বাদ না পেলেও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সেই অভ্যেস গড়ে উঠতে সুবিধে হয়। লেখাপড়া নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেন, তাঁরাও অনেকেই বলেন যে নিয়মিত ইস্কুলে যাওয়ার অভ্যেস গড়ে উঠললে এই সবব ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু শিখতে পারে যা ইস্কুলে না যেতে পারললে তারা কোনোক্রমেই শিখবে না। অর্থাৎ ইস্কুলে যাওয়াটা তাদের পক্ষে একটা বড়ো সুযোগ, যে সুযোগ পেলে দেশের মানব-সম্পদ উন্নয়নেরও এক নতুন দিগন্ত গড়ে তোলা যায়। কিন্তু হায়, কিন্তু হায়, আমরা তাদের সেই সুযোগ দিতে আর রাজি নই, কারণ আমরা – যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত – তারা দেখছি আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েরা পাস-ফেল না থাকলে পড়াশোনা রপকে আপ আগ্রহী হচ্ছে না (সবাই নয়, কিন্তু কেউ কেউ) আর তাই আমরা নিজেদের স্বার্থে গরিব, প্রান্তিক আর আদিবাসী সমাজের শিশু আর বাল-বালিকাদের পড়াশোনার অভ্যেস গড়ে তোলার জন্যে সময় বা সুযোগ দিতে রাজি নই। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার আমাদের জানিয়েছেন উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা চালু হওয়ার পর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পুষ্ট শহুরে মধ্যবিত্তদের এক বড়ো অংশ দেখল যে পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ খুলে দিচ্ছে, ফলে তারা সাগ্রহে সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরল, আর সেভাবেই আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর মধ্যবিত্তের ছড়ি ঘোরানোও শুরু হয়ে গেল। আর তাই, এখনও আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের ধারণা এবং সুবিধে অনুযায়ীই চালাতে চাই, যাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের সুবিধে হয়। সে কারণেই, ইস্কুলে পরীক্ষা-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে আমরা খুবই আগ্রহী, যাতে আমমাদের সন্তানরা গোড়া থেকেই প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে – তাহলে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা তছা চাকরির ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে সুবিধা হবে।

কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি তাদের কথা, যাদের কাছে শিক্ষা কোনো প্রতিযোগিতার বিষয় নয়, বরং নিতান্তই মৌলিক চাহিদার বিষয়, যারা দীর্ঘ বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে শিক্ষার সুবিধে থেকে বঞ্চিত, যাদের অধিকার আছে শিক্ষার আঙ্গিনায় পা ফেলার। তাদের জন্যেই, পাস-ফেলের বিভীষিকা কাটিয়ে ইস্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা ইচিত। তাদের এ সুযোগ না দিলে যে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাচিত্রটা পালটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও গড়ে উঠবে না, আর তার ফলে যে আঘের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রচেষ্টাও মাঠে মারা যাবে – এই আশঙ্কাও আমাদের চিন্তার জগতে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেত পারছে না।

আমরা হয়তো অনেকেই এটাও ভেবে দেখছি না যে সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের শিশু বা বালক-বালিকাদের শৈশবব বা বাল্য-কৈশোর সেভাবে গড়ে ওঠার সময়ই পায় না, কারণ সামান্য বড়ো হলেই তাদের কাজে লাগিয়ে দেওয় হয় – তাই পাস-ফেল না থাকলে তারা অন্তত ইস্কুলে গিয়ে তাদের হারানো শৈশব ফিরে পেতে পারত, কিন্তু সে সুযোগও আমরা তাদের দেব না।

কেউ বলতেই পারেন, এইসব পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা কি সর্বদাই পিছিয়েই থাকবে? আর সে জন্যে কি চিরকালই পাস-ফেল থাকবে না? প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত। যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন-ইউ-পি-এ সরকার যখন পাস-ফেল তুলে দিয়েছিল তখন সেই সঙ্গে আরও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল – তা হলো ইস্কুলে ইস্কুলে প্যারা-টিচার নিয়োগ করা – সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকায় যে সব প্যারা-টিচাররা ওই সব পিছিয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের জন্যে বিশেষ ক্লাস নেবেন, প্রয়োজন হলে বাড়ি-বাড়ি দিয়ে তাঁরা সেই সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন। কার্যক্ষেত্রে দদেখা গেল, অধিকাংশ সরকারি বা সরকার-পোষিত ইস্কুলেই সেই সব প্যারা-টিচাররা সাধারন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতোই ক্লাসরুমেই ক্লাস নেন, পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জন্যে বাড়তি ক্লাস নেওয়া, বা ইস্কুলের নির্ধারিত ক্লাসের সময়ের বাইরে প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা – এ সব কাজ তাঁরাও করেন না, অধিকাংশ ইস্কুলেরও তাতে কোনো আগ্রহ নেই। ফলে যা হবার তাই হলো – পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা বাড়তি সুযোগ পেল না, তাদের শিক্ষার উন্নতি হওয়ার কোনা সুযোগ আমরা দিলুম না, আর তার পর তাদের পড়াশোনার উন্নতি হচ্ছে না। -এই কথা বলে পাস-ফেল প্রথা ফিরিয়ে এনে তাদের ইস্কুলে আসার পথে আরও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে দিলুম।

অর্থাৎ, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যে প্যারাডাইম –সেই প্যারাডাইম এ এই সব দুর্বল গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা মানিয়ে নিতে পারল না বলে তাদের জন্যে তৈরি করা বিশেষ সুবিধে আমরা কেড়ে নিতে চাইছি। অথচ, ভেবে দেখলুম না তাদের পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করতে চাইলে তাদের মতো করেই ভাবতে হবে – আমাদের ছকে তাদের ফেললে হবে না।

অনেকটা এমন কথাই বলেছেন প্রতীচি ইনস্টিটিউটে কর্মরত দুই গবেষিকা। গত ১২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি নিবন্ধে তারা দেখিয়েছেন একটি শিশুর গায়ে ফেল –এর তকমা লাগিয়ে দেওয়াটা সমাজের পক্ষে কতখানি অন্যায় বা অবিবেচনার কাজ হতে পারে। তাঁরা এও দেখিয়েছেন যে কেমন করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অজ্ঞানতা-প্রসূত কারণেই ইউ-পি-এ সরকারের এই no-detention নীতি মুখ থুবড়ে পড়ল, যাতে আখেরে ক্ষতি হলো দেশের সমগ্র মানবসম্পদের।

আমরা কি আরেকটু ভেবে দেখথে পারি না? শিশুদের ফেল করালেই কি জাতি হিসেবে আমরা পাস করব?